উত্তরকাণ্ড

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল পাটনা ছেড়েছি। মেছুয়াটুলির মেসবাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে গেছে তারও বছর দুয়েক আগে। তবু সেখানকার দিনগুলোর স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে আনাগোনা করে।

মেছুয়াটুলির মেসবাড়ির মধ্যমণি ছিলেন আমাদের কিশোরীদা। তবে শেষদিকে ওঁকে আর আমরা তেমন করে পাইনি। অসময়ে আধ্যাত্মিকতার শিকার হলেন কিশোরীদা। লম্বা পরমায়ু হলে লোকে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নেয়। দেহ-মন-ইন্দ্রিয় সবকিছু যখন ক্রমে ক্রমে জবাব দিতে থাকে শেষ খেয়ার কড়ি হিসেবে আধ্যাত্মিকতার কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু কিশোরীদার ক্ষেত্রে তা হয়নি। দাঁতের অভাবে শাকাহারী হওয়া নয়, ভবজীবনের শীর্ষকালেই গেরুয়া ধরলেন। মাথার উপর গনগনে মধ্যাহ্ন সূর্য খরশিখা ছড়িয়ে দিচ্ছে যখন, কিশোরীদা সবকটা দরজা জানলায় চিক টেনে জীবন সায়াহ্ন রচনা করলেন।

মেছুয়াটুলির মেসবাড়িতে থাকাকালীন কিশোরীদা একটা নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করে তার প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন। আমাদের চেনা জানাদের মধ্যে বেশ ক'জনকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন। গণ্শার পিসেমশাই, নিতাইদার দাদাশ্বশুর, গোবিন্দর ঠাকুরমা ও আরও অনেক নতুন শিষ্য হয়েছিল কিশোরীদার। তাঁরা সকলেই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, এক এক করে গত হলেন নতুন ধর্মগ্রহণের পরে পরেই। অবশ্য তাঁদের গত হ'বার সঙ্গে নতুন ধর্মের কারণগত কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁদের যাবার সময় হয়েছিল, নতুন ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তাঁরা মনের ভার হাল্কা করে যেতে পারলেন। কারণ কিশোরীদার উদ্ভাবিত ধর্ম ভারী উদার, করুণাপরবশ ও সমবেদনাময়। নরক, কুম্ভীপাক, হেল, দোজখ এসব ভীতিজনক বিষয়ের কোনও উল্লেখ নেই এতে। এই বিশাল সংসারকাণ্ডে মানুষ এক ক্ষুদ্র প্রাণী। যথাসাধ্য ভাল থাকার চেষ্টা করে। নিজের প্রকৃতিগত দুর্বলতার দরুণ মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলে। ভুল করে কষ্ট পায়, পশ্চাতাপ করে। "ভুলকরা মানুষেরই সাজে, এটা কোন অক্ষম্য অপরাধ নয়", "সকালের পথহারা পথিক সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে গেলে তখন আর তাকে পথহারা বলা যায় না", "পাকাপাকি ভাবে কাউকে পাপী বলে চিহ্নিত করা উচিত নয়", ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিশোরীদা তাঁর এই নবলব্ধ ধর্মের বাণী বৈতরণি পারে পৌঁছে দেবার জন্যে যাত্রা করেছিলেন। মানসরোবরের কাছাকাছি সীমান্ত রক্ষীদের হাতে ধরা পড়েন। তারা তাঁকে টেররিস্ট ভেবেছিল। কিশোরীদার লাল রঙের লম্বা খাতাখানায় শিষ্যদের নাম-ধাম ঠিকানা লেখা ছিল। রক্ষীরা ভাবলো সেগুলো টেররিস্ট সম্পর্কিত তথ্যাবলী। কিশোরীদা তাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। এরপর তাঁর আর কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। শুধু আমাদের মেসের ধীরেশ ধর বললো সে নাকি একবার কিশোরীদাকে দেখেছে। সামনাসামনি নয়, টিভির পর্দায়। টিভিতে নিউজ দেখাচ্ছিল। সীমান্ত রক্ষীদের হাতে যে সব আতঙ্কবাদী ধরা পড়েছে তারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদেরই মাঝে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কিশোরীদা। ধীরেশ ধর বললো তার চিনতে এতটুকু ভুল হয়নি। কিশোরীদা নাকি তাকে দেখে চোখ টিপে ইশারা করেছিলেন সেই টিভির পর্দা থেকেই।

কিশোরীদা যাবার পর মেছুয়াটুলির মেসবাড়ির আগের সেই গরিমা আর রইলো না। তবু রুজি রোজগারের তাগিদে প্রবাসে পড়ে থাকা মানুষগুলোর আশ্রয় হিসেবে মেসবাড়িটা টিকে রইলো। কিছুদিন পরে বাড়ির মালিক কৈলাসপতি সিন্হা এসে পড়লেন। মেসবাড়ির তেতলার ঘর দু'টো খালি করিয়ে সিন্হাজী তার ভাগ্নে রসিকলালকে নিয়ে সংসার পাতলেন সেখানে। কৈলাসবাবুর বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। সেনা বিভাগের কোন এক দপ্তরে কেরানী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর দেরাদুনে কয়েক বছর কাটিয়ে এখন নিজের

ভিটেয় ফিরে এলেন। রসিকলালের বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। রসিকলাল শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে অবধি মামার হেফাজতে আছে। সিন্‌হাজী অকৃতদার।

ওরা আসায় মেসবাড়ির দৈনন্দিন জীবনে বেশ খানিকটা পরিবর্তনের হাওয়া লাগলো। সিন্‌হাজী অবিসংবাদী ভাল মানুষ। ভাগ্নেটি একেবারে উল্টো। তবে রসিকলাল যে ঠিক কি চীজ বুঝে ওঠা কঠিন - নানা ক্ষণে নানা রূপ তার।

ওঁরা মেসবাড়ির খাবার নেন না, স্বপাক খান। রান্নাটা রসিকলালের দায়িত্ব হলেও সিন্‌হাজীকে ভাগ্নের ঘাড় ধরে কাজটুকু আদায় করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। ছুটির দিনে এবং অন্যান্য দিন অবসর সময়ে তিনতলার হিমযুদ্ধের হিমেল হাওয়া মেসবাসিদের হাড় কাঁপিয়ে দেয়। ওঁদের বাকি কাজ - কাপড়চোপড় কাচা, মশলা বাটা, বাসন মাজা, ঝাঁটপাটের জন্য একটি ঠিকে ঝি তার কিশোরী মেয়েকে নিয়ে দিনে একবার আসে। সারাদিনের কাজ-পাট মিটিয়ে চলে যায়। দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজে রোজ ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গে মেসবাসিদের। অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ ও তার বেকার ভাগ্নের ভোর রাত্রে অত তড়ি ঘড়ি বাড়ির কাজ করানোর প্রয়োজন কেন হয় তিতিবিরক্ত মেসবাসিরা বুঝে উঠতে পারে না। তবে বাড়িওলাকে চটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয় ভেবে এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করে না কেউ।

বাড়িওলা মেসবাড়ির উপরতলায় এসে ওঠার পর বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেছে। আগেকার উচ্ছল খোলামেলা জীবনযাত্রায় খানিকটা আগল টানতে হয়েছে উপরতলার বাসিন্দাদের সুবিধা অসুবিধা পছন্দ অপছন্দের কথা বিবেচনা করে। অন্যদিকে নতুন কিছু অসুবিধার সূত্রপাত হয়েছে ওদের আগমনে। মামা ভাগ্নের সোচ্চার মনমালিন্যের ঝাপটা এসে যখন তখন এদের ছুটির মেজাজ মাটি করে দেয়। ভোর রাত্রে অবগুণ্ঠিতা কাজের মহিলারা এসে ঠনাঠন দরজার কড়া নাড়ছে তো নাড়ছেই, নাড়ছেই। মামা-ভাগ্নের যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। তামাম মেসবাড়ির ঘুমের বারোটা বেজে যায় কিন্তু ওদের আর চোখ খোলে না। কতক্ষণ পরে সিন্‌হাজীর ঘড়ঘড়ে গলায় ভাগ্নের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হয়। তা-ও চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ এবং শেষমেশ একজন এসে - সাধারণত সিন্‌হাজীই, কচিৎ কোনদিন সূর্য পশ্চিমে উঠলে রসিকলাল - দরজা খুলে দিলে দুই কলাবৌ ভিতরে প্রবেশ করে।

মাঝে দু'তিন দিন বেশ চুপচাপ ছিল সব। না বকাবকির আওয়াজ, না কড়া নাড়ার আওয়াজ। আহা, এরকমই যদি থাকতো! কিন্তু তা হ'বার নয়। এ শুধু ঝঞ্ঝাবাতের আগের নিস্তব্ধতা, ঝড়ের পূর্বাভাস। দু'দিন দু'রাত সাড়াশব্দ নেই। তৃতীয় দিন মেসবাসিরা অফিস থেকে ফিরে বাইরের পোষাক পাল্টে সবে চায়ের কাপে চুমুক লাগিয়েছে, রসিকলাল দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে এসে ডুকরে কেঁদে উঠলো - মামা মিসিং। সিন্‌হাজীকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। ক'দিন আগের তুমুল ঝগড়ার পর এ ক'দিন মামার ঘরে উঁকি মেরেও দেখেনি রসিকলাল। আজ উঁকি মারতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলো মামার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। না এ ঘরে না ও ঘরে, না বাথরুমে না বারান্দায়। রসিকলাল হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। সে কান্না আর থামে না। বড় মানুষ অমন করে কাঁদলে ভারি অস্বস্তি লাগে। তাকে তো আর বাচ্চাদের মত ভোলানো যায় না! তাকে কোলে নেওয়া যায় না, লেবেনচুস্ দেওয়া যায় না। মধ্যে থেকে অস্বস্তির একশেষ। তবু কোনমতে রসিকলালের কান্নার ফাঁকে পুরো ব্যাপারটা ওর মুখ থেকে শুনে নিলো সবাই । মামা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে রসিকলাল জানে না। তার ভয় একটাই - মামা তান্ত্রিক সাধকদের হাতে না পড়ে। পাটনা জুড়ে নতুন নতুন এলাকায় বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। মানানসই বাড়ির জন্যে চাই শক্ত গাঁথুনি, পোক্ত ভিত। এই সময় পাড়ায় পাড়ায় ছেলে চুরির হিড়িক। কলকাতায় হাওড়া ব্রিজ তৈরীর সময় ঠিক যেমন হয়েছিল। নররক্তে নিখরচায় শক্ত-পোক্ত বাড়ি তৈরী হবে। কন্ট্রাক্টারের গাঁটের পয়সা বাঁচবে।

"কিন্তু সে তো ছোট বাচ্চারা চুরি যায়, সিন্‌হাজীর মত বুড়ো হাবড়া - থুড়ি - বয়স্ক মানুষের রক্ত নেবে কেন?"

রসিকলাল চোখ লাল করে চারিদিকে দেখে নিয়ে শার্টের খুঁটে কষকষে করে ঘষে ঘষে চোখ মুছলো।

আরও দু'দিন কাটলো। সিন্‌হাজীর হদিস নেই। রসিকলাল এ ক'দিন সকালের জলখাবার, দুপুরের ভাত ডাল, রাতের রুটি তরকারী মেসবাসিদের সঙ্গে বসে খাচ্ছে। কাজের দুই মহিলাও আসে না আর, মামা-ভাগ্নের তুমুল ঝগড়ার পর আর এপথ মাড়ায়নি তারা। যে কারণে সকালের দিকটা মেসের তাবৎ বাসিন্দারা বেশ ভাল করে ঘুমোতে পারছে। কাক-ডাকা ভোরে জেগে গিয়ে তাদের কড়িকাঠ গুণতে হচ্ছে না আগের মত।

এরপর যা হল তা আরও নাটকীয়। পঞ্চম দিন ভোর বেলা গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে খুব শোরগোল তুললেন যিনি তিনি সিন্‌হাজী স্বয়ং, ভাগ্নে রসিকলাল নয়।

মেসের সবাই তাকে ঘিরে ধরে নানান প্রশ্ন ছুঁড়তেই উনি হাত নেড়ে তাদের বিরত করে বললেন, "রসিকলাল মিসিং। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কন্ট্রাক্টারের ভাড়া করা তান্ত্রিকদের হাতে না পড়লেই রক্ষে।"

দুপুর নাগাদ র‍্যান্‌সাম নোটও এসে গেল। নগদ এক লাখ টাকা না দিলে রসিকলালের কাটা মুণ্ডু পাঠাবে, সবাইকে তার ফটো পাঠাবে সিন্‌হাজীর আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে আছে। সবাই জানবে হাড়কিপ্‌টে মামা ভাগ্নেকে বাঁচাতে ওই কটা টাকা খরচ করতে পারলো না। দুয়ো দেবে সবাই।

সিন্‌হাজীর বয়স হয়েছে। তার উপর নাকি হৃদরোগ, হাইপার টেনসন, ডায়বিটিস ও আরও কি সব আছে। সিন্‌হাজীই জানালেন আমাদের। থানা পুলিস করতে চাইলেন না, ভাগ্নের জীবন বিপন্ন হবে তাতে। র‍্যানসামের টাকাটাই দিয়ে দেবেন বরং, পুরো এক লাখ টাকা। তবে একা একা দুষ্কৃতিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হচ্ছে না তাঁর, কোন সঙ্গী পেলে ভাল হয়। তাবৎ মেসবাসি এক কথায় রাজী। রসিকলালের প্রাণ বাঁচাতে সক্কলে সঙ্গী হবে তাঁর। অঘোরি, কাপালিক যেরকম তান্ত্রিকই হোক না কেন, ওরা নির্দ্বিধায় এগিয়ে যাবে সিন্‌হাজীর পাশে পাশে ----।

সেই কথাই রইলো। যারা র‍্যানসাম নোট পাঠিয়েছিল তারাই ফোন করে জানালো টাকাটা কোথায় নিয়ে যেতে হবে। বললো, তেতলায় আটার টিনের উপর বাটি চাপা দেওয়া কাগজে ঠিকানা ও রোড-ম্যাপ দেওয়া আছে। ঠিক তাই। এতগুলো মানুষের চোখের সামনে দিয়ে কখন সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলার ঘরে ঢুকে আটার টিনের উপর কাগজটা রেখে গেছে কেউ টেরও পায়নি।

মেসবাসীরাই কেউ গিয়ে দু'টো ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এলো। ঠাসাঠাসি করে বসলো সবাই। ঠিকানার কাগজটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিয়ে বললো, চলো ----- রাজেন্দ্র নগর। বাড়ির কাছাকাছি এসে সানাইয়ের পোঁ শোনা গেল। ডানদিকে দোতলার একটা ফ্ল্যাটের ব্যালকনি কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো। ক্যাসেটে সানাই বাজছে ওখানেই। ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়লো সবাই। মনে হয় দোতলার জানলা থেকে এদিকে নজর রাখছিল কেউ।

একটা হাসিখুসি নধর বালক এসে বললো, "ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে বলেছে। অনেকক্ষণ লাগবে, কনে সবে পিঁড়েয় বসেছে।"

ততক্ষণে ভিতর থেকে একজন মহিলা এক বৃদ্ধের হাত ধরে বেরিয়ে এলো। সবাইকে অনুরোধ করলো ভিতরে যেতে। সিন্‌হাজী ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলেন। বললেন প্রভাবতীকে তিনি বরাবর কন্যাস্নেহে দেখে এসেছেন। তার হতচ্ছাড়া ভাগ্নের যে এমন সুমতি হবে, এমন সৌভাগ্য ঘটবে, প্রভাবতীকে বাড়ির বধূ রূপে পাবেন, এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

এক লাখ টাকার প্যাকেটটা ব্রিফকেস খুলে বার করে মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, "এতদিনে আমি ঋণমুক্ত হলাম। এবার আমি একজন সৎ মানুষের মত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবো।"

মহিলা প্যাকেটটা সিন্‌হাজীর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললেন, "এ টাকা আমার মেয়ের বিয়ের যৌতুক। আমার জামাইয়ের অভিভাবক হিসেবে আপনার হেফাজতেই থাকুক।"

বিবাহ অনুষ্ঠানের শেষে ভোজ খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে ট্যাক্সিতে বসে মেছুয়াটুলিতে ফিরে এলো সবাই। এবার তিনখানা ট্যাক্সি লাগলো। পুরো ব্যাপারটা খোলসা করে কেউ না বলে দিলেও ভাসা ভাসা যা বুঝলাম তা এই - প্রভাবতী ও তার মা শকুন্তলা দেবী সিন্‌হাজীর পাটনার বহু পুরাতন এক সহকর্মীর কন্যা ও পত্নী। সহকর্মীটি অনেক বছর আগে মারা গেছে। তার কিছু টাকা - সুদে আসলে এতদিনে লাখ খানেক হত - সিন্‌হাজীর কাছে আটকা পড়েছিল। সিন্‌হাজী সেটা ফেরত দেবার বিশেষ তাগিদ অনুভব করেননি। নিঃসহায় শকুন্তলা দেবী পরের বাড়ি কাজ করে নিজের ও মেয়ের এবং বৃদ্ধ শ্বশুরের ভরণ পোষণ করে এসেছেন এতকাল। সিন্‌হাজী পাটনায় ফিরে এসেছেন খবর পেয়ে শকুন্তলা দেবী আত্মপরিচয় গোপন করে তাদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ নিলেন। সিন্‌হাজী ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি। প্রথমে সিন্‌হাজীর ও তারপর রসিকলালের নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটা সঠিক জানা নেই। হয়তো সিন্‌হাজী ভাগ্নের উপর রাগ করে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। আর ঝিয়ের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়েতে মামা কোনমতেই রাজি হবে না জেনে রসিকলাল গৃহত্যাগী হয়েছিল। অবশ্য বিহারে হবু বরকে কিডন্যাপ করে জোর করে বিয়ে দেওয়ার ঘটনা বিরল নয়। তবে মনে হয় "কিডন্যাপ ও র‍্যানসামের" ব্যাপারে রসিকলালের পুরো যোগসাজস ছিল যদিও তার মামা যে প্রভাবতীর বাবার টাকা আত্মসাৎ করেছে এ কথা সে ঘুণাক্ষরেও জানতো না। কিংবা হয়তো জানতো!

ইভা খাসনবীশ